নীলাঞ্জনা

মিহির চক্রবর্তী

সারাদিন অন্য কোনও সময় না পাক, অন্তত একবার রাত বারোটার পর কিংশুক তার কমপিউটার খুলে বসবেই। রাতের দু ঘন্টা সময় কাটায় ঐ যন্ত্রটার সামনে। প্রথমেই ই-মেল চেক করা এবং প্রয়োজনীয় উত্তর থাকলে দিয়ে দেওয়া। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলে একটা খাতায় ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার টুকে রাখা। সময় মতে উত্তর তৈরি করে একসময় পাঠিয়ে দিলেই চলে।

ইদানীং এক নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। কোথাকার এক নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জী তাকে সময় সময় ধমকাচ্ছে আর গালিগালাজ করছে। আপনি ভেবেছেনটা কী? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। দু কলম লিখতে পারেন বলে যা ইচ্ছা তাই লিখবেন? সুমিতার প্রতি অতো ঘৃণা কেন? তার প্রতি ঘৃণা দেখাতে গিয়ে আপনি মেয়ে - জাতটাকেই অপমান করতে চেয়েছেন! হয় নারীচরিত্র আপনি সম্যক বোঝেন না, নয়তো আপনার ব্যক্তিজীবনের ক্ষোভ বা ঘৃণা থেকে সুমিতাকে এমনভাবে এঁকেছেন। আপনার রুচির প্রশংসা করতে পারছি না। জানেন আপনার সুমিতার গল্প পড়ে আমি দুদিন ধরে কেঁদেছি। একজন মেয়ে হিসাবে লজ্জিত হয়েছি, এমনকী আমরা আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। আমি যদি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতাম, তবে মৃত্যুর জন্য আপনাকেই দায়ী করতাম। আপনারা লেখকরা এমন নিষ্ঠুর কেন?

কিংশুক নিজের মনেই হাসে। এমন পাঠক - পাঠিকার সংখ্যাও তো কম নয়। তবে এরা বই কেনে এবং পড়ে; সুতরাং এদের চটিয়ে লাভ নেই। নিরাসক্ত মনে কিংশুক মজা পায়। এরা আছে বলেই তো ওরাও আছে । ভাগ্যিস মেয়েটি আত্মহননের পথ না বেছে দুটো গালাগাল দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে!

আর একদিন নীলাঞ্জনা লিখছে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। কয়েকঘন্টা দিতে পারেন? আপনাকে এতোবার ই-মেল করলাম, এতো কথা জানালাম, নেহাৎ সৌজন্যবোধেও তো মানুষ একটা উত্তর দেয়। আপনার দেখছি সামান্য একটা ভদ্রতাবোধও নেই। ভাববেন না আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। আপনার প্রেমে পড়তে আমার বয়েই গিয়েছে। সেদিন আপনাকে বইমেলায় দেখলাম। এমন কিম্ভূতকিমাকার পোষাক পরে ডায়াসে উঠলেন যে হাসি চেপে রাখতে পারিনি। দেখে তো বোঝাই মুশকিল হচ্ছিল ইনি সাহিত্যিক না পকেটমার মাস্তান। রংবাহারী ছোপছাপ মারা একটা টি শার্ট আর একটা বেঢপ ট্রাউজার। একটু সভ্যভব্য পোশাক পরতে পারেন না? আপনি মোটেই সিনেমার হিরোর মতো দেখতে নন যে যা হোক কিছু একটা পরবেন আর মানিয়ে যাবে! আপনিই যে স্বনামধন্য লেখক, ঘোষক বলে না দিলে বোঝা মুশকিল হচ্ছিল। সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবিতে কিন্তু আপনাকে সুন্দর মানায় ওটাই আপনার পোশাক। অনেক অভিযোগ সত্ত্বেও আপনাকে সত্যি শ্রদ্ধা করি কারণ আপনাকে ভালোবাসি, আপনার মঙ্গল চাই।

কিংশুক ভেবে দেখেছে এ সব পাগলের সাঁকো নাড়া দিয়ে লাভ নেই। আরও পেয়ে বসবে। সামান্য এক সুমিতা সেনের গল্প পড়ে এমন প্রতিক্রিয়া শোনা যায় না। ওর কিছু সাহিত্যিক বন্ধুও মাঝে মাঝে আড্ডায় তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনায় বটে, কিন্তু এমনটা ঠিক ধারণায় আসে না। কে এই নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জী? বয়েস কতো। যোগাযোগের সব ব্যবস্থাই ই-মেল ঠিকানায় আছে। কিংশুকের মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হয় মোবাইলে একটা ফোন করতে; তবে তাতে বিপত্তি আছে। তার নম্বরটা তো রেকর্ড হয়ে যাবে। সময় অসময়ে ফোন করে বকবকানির ঠেলায় কাজ ভুলিয়ে ছাড়বে।

কিংশুক নিজেও জানে সুমিতা সেনের গল্পটা নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই। গল্পটা মোটেই উঁচু মানের নয়। সমালোচক বা সাধারণ পাঠকরা খুব একটা আদরে গ্রহণ করেনি। কোনও কোনও বর্ষীয়ান লেখক যাঁরা ওর দাদার মতো, তাঁরা বলেছেন, কি ভায়া এবার কি পর্নোর দিকে ঝুঁকবে নাকি? না না ওটা তোমার পথ নয়। বেশ তো উতরে যায় অন্য স্বাদের লেখা, হঠাৎ কী ভূত চাপলো যে বটতলা সিরিজে ঢুকতে চাইছো? দেখ ভায়া সবাই তোমার বলিষ্ঠ গদ্যের ভক্ত, কিন্তু সুমিতা সেনের কেচ্ছা কেউ মেনে নেবে না।

তবু কিংশুক সুমিতা সেনকেই বেছে ছিল। অনেকখানি দরদ দিয়ে অনেকবার কাটাকুটি করে ও বাস্তবের এক সুমিতা সেনকেই তুলে এনেছিল ওর সাদা পাতার ওপর কালো কালিতে। সাহিত্যের ছাত্র কিংশুক মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল সাহিত্য চলমান জীবনের আয়না। কিন্তু যা ঘটে তা-ই শুধু সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে তা নয়; হয়ে ওঠা জীবনটাকে ধরতে হবে। তাই সাহিত্যের সত্য জীবনের সত্যকে অতিক্রম করে যায়। আয়না বা দর্পণে বাস্তব আমি - টার, পাত্রপাত্রীর যে রূপ দেখায়, সেটা কায়ার, সাহিত্য সেই আয়নার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে চায় মনের ছবিটাকে। বাস্তব সত্যের সঙ্গে অন্তর্নিহিত সত্যের এখানেই ফারাক—এটাই লেখকদের উপলব্ধির জগৎ— অন্তত তার ধারণায়।

এইখানেই সুমিতা সেনের সঙ্গে সংঘাত। কেউ জানে না, কিন্তু কিংশুক তো জানে সুমিতা সেন কোনও কাল্পনিক চরিত্র নয়—চলমান জীবনে কোনও এক হয়ে ওঠা অতি বাস্তব চরিত্র। কিংশুক তার মনের দুর্বলতার রঙ মিশিয়ে তাকে মহত্ত্বে উত্তরণ ঘটাতে চায়নি। বাস্তব থেকে তুলে এনেই একেবারে বাস্তব করে এঁকেছে, প্রায় অবিকৃত করে।

সুমিতা সেন আসলে কিংশুকের বাস্তব প্রেম। সেদিনের সেই সাদামাটা সরকারি কেরানির জীবন। স্বপ্ন দেখার জীবন। তাঁর পঁচিশের যৌবনে ঝাঁপ দিয়েছিল আঠার বসন্তের মায়া নিয়ে বিত্তবান বাবার আদুরী সুমিতা সেন। কিংশুক তার সংবেদনশীল মন দিয়ে ফেরাতে চেয়েছিল নিছক ছাত্রী হিসাবে পড়তে আসা লাস্যময়ীকে। কিন্তু আঠারোর দীপ্তি আর তেজ কমাতে পারেনি কিংশুক। সেই প্রেমের উপলব্ধির আর উপভোগের অনন্য অব্যক্ত স্বাদ সে তার পরিণত বয়সের সাহিত্যে ফোটাতে চেষ্টা করলেও গভীরতাটুকু তুলে ধরতে পারেনি। যে সুমিতা সেন তার সবটুকু (যে সবটুকু সব মেয়েরই থাকে) দিয়ে কিংশুককে ভালোবেসেছিল, নিজের এবং তার যৌবনের কোনও অভাব না রেখে একটানা পাঁচটা বছর। তার অন্তরে অন্তরে স্বামী - স্ত্রী ভাবতে পেরেছিলো বলেই তো দেহমনে এমন সর্বস্ব দেওয়া - নেওয়ার মানসিকতায় এসে থাকবে; এই সহজ বিশ্বাসটা জীবনের কোনও জটিলতায় হারিয়ে যায়।

সুমিতা সেন ভেবেছে জীবন চলুক জীবনের নিয়মে সোনার ফসল তোলার সময় নষ্ট করি কেন! কিংশুক নিশ্চয় একদিন উন্নতি করবে ওর বাবা কাকা জ্যাঠার মতো। কতো অপদার্থ পটাপট ভাল চাকরি পাচ্ছে কিংশুক কি পারবে না ? সামান্য টাকায় প্রেম ভালবাসা চলে অফুরান, কিন্তু দিন গুজরান হয় না। এক কিংশুককে আপন করতে গেলে বাকি সব থেকে সরে গিয়ে দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণার জীবন বেছে নিতে হয়। এতোকাল বিলাস আর প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হওয়া সুমিতা সেন পারবে না মেনে নিতে। কারণ প্রেম নাকি

লাঞ্ছিত হবে। বাড়িতে মানবে না সে তো জানা কথা। আর তাদের দুঃখ দেবার অধিকারটাই বা কোথায়! তবে কি কিংশুকরা ভালোবাসর অঙ্গীকারে প্রকারান্তে বিত্তবান হওআর স্বপ্ন দেখে এই অনন্য উপায়ে। সুমিতা সেনকে তো অনেকেই চায়!

কিংশুক বুঝিয়েছিল। প্রথম দিনেই তাকে ফেরাতে চেয়েছিল। বড়লোকের মেয়ে বাবা, প্রেমবিলাসিতা একটা রোগের মতো, বাপকে বল একটা সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দিতে। আমরা গরীবমানুষ জন্ম থেকেই। তোর বাপের মতো আলাদিনের কালো চিরাগটা আমাদের হাতে কোনওদিনই আসবে না। ফিরে যা পাঁচি–সুখে জীবনযাপন কর।

কিন্তু আঠারো বসন্ত বড়ো তেজী। তুই থেকে তুমি হলো। সুমিতা সেন ঐশ্বর্যের আতিশয্যে আর আদর্শবাদিতায় এসব সত্যকে সে আমল না দিয়ে প্রেমের মহত্ত্বের জয়গান গাইলে। অতএব গরীব বাবা যখন রেলের কর্মী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলেন, সেই সুন্দরী মহিলার ছবি দেখেই ক্ষেপে গিয়েছিলো সুমিতা সেন। বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল কারণ প্রেম। সুমিতা সেনের বক্তব্য প্রেম করবে আমার সঙ্গে, বৌ বৌ খেলবে আমার সঙ্গে আর বিয়ে করবে অনাঘ্রাতা আর এক জনকে। কেন! রেলে চাকরি করে বলে?

কিংশুক হেসে বলেছিল বাবা আসলে আমার অবস্থানটা জানতে চাইছেন। বাবা তোমাকে কী চোখে দেখেন সেটা তোমার অজানা নয় তবু ভয় পান তুমি বিত্তবানের মেয়ে, এ সংসারে খাপ খাবে তো? ওঁদের বয়স হয়েছে, ওরা আমাদের চেয়ে জগৎটা অনেক বেশি দেখেছেন, অভিজ্ঞতাটাও অনেক গভীর। মনে আছে একদিন তুমি আমি দুজনেই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছিলাম। তুমি পুজো দিয়েছিলে, পুজোর প্রসাদের মধ্যেই শালপাতায় মাখানো সিঁদুর ছিল। সেই সিঁদুর আমি তোমার কপালে ও সিঁথিতে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম আজ থেকে আইনত না হলেও ধর্মত তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী। তুমি চোখের জলের সঙ্গে এ মন্দিরেই আমাকে প্রণাম করেছিলে স্বামীত্বের সম্মানে।

আজ এতোদিন পর এ সব প্রশ্ন কেন? তোমার বাবা কাকার পয়সার দেমাক এবং অহংকার আমি আমার মনুষত্বে জয় করবো। শ্রদ্ধায় ভালোবাসায়। তুমি চাইলে বিয়েটা আজই হতে পারে; ওঁরা কষ্ট পাবেন। তুমি আমার মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মালে এ সব প্রশ্ন উঠতোই না। কবে তুমি কেরানি - কিংশুকের আটপৌরে বউ হয়ে সংসার নিয়ে নাজেহাল হতে।

না, শেষ পর্যন্ত পারেনি সুমিতা সেন। হৃদয়দৌর্বল্যে ভেসে বড়ো বড়ো কথায় ফানুসে ভাসা আর কঠিন মাটির উত্তপ্ত বাস্তব এক ব্যাপার নয়। পরিষ্কার জানিয়ে দিল সে জীবনে প্রাচুর্য ছাড়া আর কিছু দেখেনি। এর প্রেম এবং ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটুক তা চায় না। আর তো কিংশুককে নতুন করে তার দেওয়ার কিছু নেই। সন্তান ছাড়া সবই পেয়েছে— সামাজিক বিয়ে না হলেও ওটা পাওয়া উচিৎ নয় বলেই পায়নি। সব মানুষের জীবনেই তো কিছু অপূর্ণতা থাকে, সেটুকু নিয়েই বাঁচতে হয়। কিংশুক তুমি অনেক সুযোগ পেয়েছো কিন্তু আমাকে পাবার যোগ্যতা চিরকালের করে ধরে রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারোনি। অপেক্ষাই সার হল। যিনি আমাকে বিয়ে করবেন তিনি আমার কী পাবেন আমি জানি না। আমার দেহটাই তো ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছো, অবশ্য তাতে আমার সায় ছিলো বলেই করেছ। এবার আমাকে অন্তর থেকে মুক্তি দাও। আমি জানি তুমি দুর্লভ না হলেও তোমার পরিবেশ লোভনীয়। দেখ না তোমার বাবার দেখা সেই রেলের ঘোষিকা মেয়েটি এখনও অবিবাহিত আছে কিনা। এসো আমরা আজ ঈশ্বরের কাছে কামনা করি, আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে ভুলে যেতে পারি।

ভুলে গিয়েছে কিংশুক। রাজকন্যা চলে গিয়েছে আর এক রাজপুরীতে। দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু জীবনের সব দুঃখকে অতিক্রম করার এক মানসিক শক্তিও খুঁজে পেয়েছে নিজের মধ্যে। শুধু অবাক হয়েছে সত্যিকারের প্রেম বা ভালোবাসা বলতে কী বোঝায়! জগৎজোড়া যে এত কাহিনী এ কি শুধু কল্পনা? এরকমভাবে চললে মানুষের দাঁড়াবার জায়গা বলে কি কিছু থাকবে। মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে না? একান্ত শব্দটাই কি মিথ্যে?

পাড়ার দুদশজন দুদশদিন নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলো। নানা বিশ্লেষণে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলো, মজা নিলো, 'কবির বুকে হাফসোল' বলে ঠাট্টাও করলো কেউ কেউ। কিন্তু ভুলেও গেল সবাই।

কিংশুক তার গল্পে এটাই বলতে চেয়েছিল— আগামী এক ভয়াবহ প্রজন্মে সুমিতা সেন - রাই প্রতিনিধিত্ব করবে। তারাও কি সন্তানদের জন্ম দিয়ে তাদের শেখাবে সৎ সুন্দর এবং আদর্শবান চরিত্রবান হতে? না কি কোনও মা তার শিশুকন্যাকে বলবে বড়ো হয়ে শরীর বেচে খেয়ো। এক ফুলে বোসো কিছুদিন চেখে দেখো তারপর না হয় একটা শক্ত গাছে পাকাপাকিভাবে লটকে যেয়ো। এই সব মায়েরাই আবার কেউ কেউ বলবে সীতা হও, সতী হও সাবিত্রী হও। তাই অনাগত এক ভবিষ্যতে কিংশুকরা হয়তো থাকবে না, কিন্তু সেই প্রজন্মে এতো বেশি সীতা সাবিত্রী জন্মাবে যে ছেলেরা বিয়ে করতে ভয় পাবে। অথবা চাইবে না। প্রেম বা ভালোবাসায় ভয় পাবে।

হয়তো একটিবারই কিংশুক একজন সাহিত্যের সেবক হিসেবে নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। তার ব্যক্তিজীবনের ঘৃণা দিয়েই সুমিতা সেনকে এঁকেছে। তার বেদনাবোধ এবং হৃদয়ের ক্ষতকে চাপা রাখতে পারেনি। অন্তত তাদের কেউ কেউ যারা অনেক কৌতূহলে ওদের লক্ষ্য করেছিল, তার জানুক সত্যটা কী? সুমিতা সেন সব প্রসঙ্গে ক্ষমা এবং করুণার অযোগ্য। ঘৃণাই ওদের একমাত্র প্রাপ্য।

অনেক রাত ধরে কিংশুক লেখালিখি করেছে। রাতের সময়টাই ওর প্রকৃত কাজের সময়। তাই ওর স্টাডিতেও একটা বিছানা পাতা থাকে; লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে গেলে ওখানেই শুয়ে পড়ে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙলো অনেক দেরিতে। প্রায় সারা রাত ধরে লিখেছে কিংশুক। গোবিন্দদা নাকি দুবার চা নিয়ে এসে ফিরে গেছে। গোবিন্দদা একাধারে ওর উপদেশদাতা অভিভাবক এবং বন্ধু। বাজার করা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সামলানোর দায়িত্ব তার। এই ধেড়ে খোকাবাবুটির প্রতি সবসময়ই তীক্ষ্ণ নজর তার। সে-ই বাড়ির কর্তা।

কিংশুককে চা খেতে দেখে গোবিন্দদা বলে, একটা কথা বলি খোকাবাবু। তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এয়েছেন সেই সকালে। তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছি। বলেছিলাম পরে আসতে, ঘুম থেকে তোলার নিয়ম নেই। তা বাপু তুমি একবার গিয়ে দেখা করে আস। একে মেয়েছেলে তার প্রায় দুঘন্টা বসে আছেন, কেমন খারাপ দেখায় না!

মহিলা? কী নাম জিজ্ঞাসা করেছিলে কিছু? চা-টা দিয়েছো? নাঃ, তোমার বয়স হয়েছে তোমাকে দিয়ে আর চলবে না।

হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কী বললে যে নীলরঞ্জনা-টনা গোছের একটা বিদঘুটে নাম। বামুনের মেয়ে পদবীটা বললে চাটুজ্জে।

ওঃ, কী মুশকিল, আমাকে আগে বলবে তো? যাও বাইরে গিয়ে বল আমি এখুনি আসছি।

ঘরে ঢুকেই কিংশুক হাত জোড় করে বলে, মাফ করবেন, আপনাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে। আসলে অনেক রাতে

শুয়েছি। ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। বলুন কী বলতে এসেছেন।

চেয়ারে পিছন ফিরে বসে থাকা নীলাঞ্জনা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রতিনমস্কারের ভঙ্গিতে বলে, আপনার দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই কিংশুকবাবু। সৌজন্য না দেখালে তো আপনাদের কোনও কদর তাকে না। আপনারা নামী - দামী লোক, এটুকু আপনাদের শোভা পাওয়া উচিত।

কিংশুক অবাক হয়ে বলে একি সুমিতা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এ তঞ্চকতার অর্থ? না মানে আপনি ঠিক আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

থাক। তুমি কোনওদিন আপনি বলতে অভ্যস্ত ছিলে না। অবশ্য এখন তো তুমি কথা বলছো নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জীর সঙ্গে। যে সুমিতাকে তুমি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছো, সে বেচারা কবে আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে বসেছে। কিন্তু হে সাহিত্যিক, জীবনের অনেক কিছু না জেনেই এমন নিদান হাঁকার অধিকার তোমাদের কে দিল?

আরে বসো বসো, কতদিন পরে দেখা। রাতে পর্দায় চিঠি লিখে ঝগড়া কর বলে সকালেই এসেছো ঝগড়া করতে। গোবিন্দ -দা একবার এদিকে এসো। তা হঠাৎ তোমার মাথায় নীলাঞ্জনার পেতনী চাপলো কেন? একটা সহজ জিনিসকে কেমন জটিল করে দিয়েছো।

নিজের কাছেই নিজের ভয় ছিল। আসলে মানুষ জাতটাই বোধহয় অন্তরে অন্তরে ভীষণ জটিল। সে জটিলতা সরল না করে, তুমি মনের জটিলতায় আমাকে কত নীচে নামালে। সেটাকে বাস্তব করতে আমার নাম পদবী সব ব্যবহার করলে—তোমার মতো ব্যাপক না হলেও তো আমার কিছু পরিচিতি আছে। তুমি কি তাদের কাছে আমাকে হেয় করতেই এই পন্থা নিয়েছো। না কিংশুক, না— তোমার মর্যাদায় এটা শোভা পায় না। তুমি তো জান না, তোমার পরিচয়ের গৌরব নিয়ে মনে মনে কতো আনন্দ পাই, কত গর্ববোধ করি। এতদিন তো অন্তর দিয়েই ভালোবেসেছিলাম।

কিংশুক ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, এসব কথা থাক। সুমিতা সেনকে নিয়ে অনেক ঝড় বয়েছে। আমার অনেক প্রিয় পাঠক, সমালোচক এটা ভালোভাবে নেয়নি। তোমার কথা বল। হয়তো সুমিতাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিতে পারি।

তার আর প্রয়োজন নেই। আমি এক্ষুনি চলে যাবো। আমার যা বলার ছিল বলা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তুমি কি বাইরের ঘর থেকেই আমায় বিদায় দেবে? তোমার পরিবার - পরিজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সংস্কারে বাধবে? এ ব্যবহারে আমার আপত্তি নেই। আমি হয়তো এই ব্যবহারেরই উপযুক্ত।

আমি জানি, তুমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো। নীলাঞ্জনার ছদ্মবেশটায় তুমি আমার বর্তমানটায় মজা নিতে এসেছো। আসলে তুমি তো সেই বিত্তবান পিতার দাম্ভিক আর অহঙ্কারী সুমিতা সেনই। তোমার অহঙ্কারের মর্যাদায় আজ ঘা পড়েছে, তাই সহ্য করতে পারছো না। তোমাকে সোজাসুজিই বলি আমার তেমন কোনও সৌজন্য দেখাবার প্রয়োজন নেই। ওই যে দেখলে গোবিন-দাদা উনিই আমার সব। আমার অন্দরমহল বা বাহির মহল বলে কিছু নেই। ওটা তোমাদের মানায়। তোমার উপলব্ধির জগৎটা কিছু মনে করো না, একটু বেশি মাত্রায় ভোঁতা– এর জন্য অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার তোমার বাবা কাকারা। তোমার জন্য তাঁরা অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু তোমার মনের বিকাশ ঘটতে দেননি। তাই তুমি জানো না খুব গভীরভাবে ভালো না বাসলে কাউকে ঘৃণাও বোধহয় করা যায় না; কারণ আমাদের ঘৃণাটাও আসে এক বেদনাবোধের গভীরতা থেকে। জীবনের কাছে আমার যেটুকু পাওয়ার ছিল আমি তা বোধহয় পেয়ে গিয়েছি। আমি আজও ভুলতে পারিনি নীলাঞ্জনা, আমি একটি মেয়েকে কালীমন্দিরে সিঁদুর পরিয়ে তাকে স্ত্রী ভেবেছিলাম, এটা আমার সংস্কার। সুতরাং দ্বিতীয়বার আর তার প্রয়োজন হয়নি। তাই, অন্দরমহল ভিতরমহল পরিজন এসবের বিলাসিতা আমার নেই। সামান্য লেখক মানুষ আমি তোমাদের মতো পাঠক - পাঠিকার অনুগ্রহে আমাদের বেঁচে থাকা।

বুঝেছি তোমার মনের জ্বালা এখনও কমেনি। মাঝখানের কিছু ক্ষতবিক্ষত হওয়ার একঘেয়ে ইতিহাস বাদ দিলে নীলাঞ্জনা তোমাকে না জানিয়ে তোমার পদবী নিয়ে তোমারই আছে। সে যদি ভিক্ষা চাইতো তবে অনেক আগে গিয়ে তোমার পায়ে পড়তো। সুমিতা সেন তোমার সামনে আসতে চায়নি কিন্তু যে দিন তুমি তাকে বাজারে মেয়েছেলের অধম বানিয়ে দিলে সেদিন সে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে মাত্র। তুমি জান না, সুমিতা সেনের সঙ্গে তার বাবা যে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলো, তার আরও দুটি বিয়ে করা বউ ছিল দুজায়গায়। খুব উঁচু দরের স্মাগলার, ড্রাগ পেডলার এবং নারী পাচারকারী। কোনও গুণের খামতি ছিল না তার। পয়সায় সে তার শ্বশুরকে দিনে পাঁচবার কিনতে পারতো। সে চেয়েছিলো সুমিতা সেনকে বেচে দিতে, ব্যবসা করাতে। কোনওক্রমে তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে সে। পুলিশের সাহায্যে সে ধরা পড়ে। কিছুদিন কেস চলার পর তার জেল হয়, তিনটি বউ-ই ডিভোর্স পায়। আর দুই বউয়ের নাম বাড়ি এবং টাকাকড়ি ছিলো প্রচুর। সুমিতা সেনের ক্ষতিপূরণের দরকার হয়নি। যে ক্ষতি তার জীবনে হয়ে গিয়েছে সেটা পূরণ করবে কে?

কিংশুক তুমি অর্ধেক সুমিতা সেনের সেই ছবিটাই এঁকেছো যেখানে তোমার একান্ত ব্যক্তিগত ভাবাবেগ কাজ করছে। বাকিটুকু তুমি জানতে না সেটা জানাতেই আসা। এবার তুমি গল্পের বাকি অংশ শেষ কর। সত্যি সুমিতা সেন মরে গিয়েছে। আজ যে তোমার সামনে কথা বলছে সে সত্যিই নীলাঞ্জনা। ছমাসের বিবাহিত জীবনে ছদিনও আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়নি। ডিভোর্সের পর তাই এফিডেভিট করে আমি নীলাঞ্জনা হয়েছিলাম আর কালীমন্দিরের সেই স্মৃতিটুকু নিয়েই আমার পদবী হয়েছিল চ্যাটার্জী। তোমার আমাকে স্বীকার করবার দরকার নেই, আমি তার জন্য আসিনি। তোমাকে শুধু এইটুকু জানাতে এসেছিলাম—ভাবী প্রজন্মের ভয় পাবার কারণ নেই— সুমিতা সেনেরা কিন্তু এক জনের মঙ্গল কামনায় তাঁদের জানতে না দিয়েও স্বামীত্বে বরণ করে শুধু অতীত স্মৃতিটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতেও জানে। তোমার কাছে নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জীর যেমন কোনও অস্তিত্ব নেই, নীলাঞ্জনারও তোমার কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই। জীবন চলতেই থাকবে শুধু এইটুকু বলতেই এসেছিলাম। বুকের ওপর থেকে পাথরটা নেমে গেল। আমার সব গৌরব গিয়েছে কিংশুক কিন্তু গর্বটা যেন থাকে।